অসীম রেজের গল্প

অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি

তাঁর মৃত্যুর খবরটা সৌম্যর কাছে ছিল খুবই অপ্রত্যাশিত। তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিন হতে বাকি ছিল মাত্র কয়েকটা দিন। কোনোদিন তাঁকে একটানা বিছানায় শুয়ে থাকতে সে দেখেনি। এমন একজন কর্মঠ, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি যে সবাইকে অবাক করে এক স্ট্রোকে এমনভাবে চলে যাবেন কে জানত। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা লেক ভিউ রোডে 'সাউথ এন্ড এপার্টমেন্টে'-এ। পাঁচতলায় টু বি এইচকে ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন একা। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মোবাইল নম্বর দিয়েছিলেন মাত্র গুটিকয়েক ব্যক্তিকে।

তাঁর সারাদিনের কাজ ছিল সোশাল সার্ভিস করে বেড়ানো; অনাথ আশ্রম চালানো এবং বস্তির ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখানো। অন্যসময় রাস্তায় ঘুরেঘুরে ফটো তোলা। কফি হাউসে নানান বিষয়ে তর্কের তুফান তোলা। আর সময় পেলে রাত জেগে লেখালিখি। বাক্সবন্দি হয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য পাণ্ডুলিপি — গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং একটা সাদা কালো চামড়ার ডাইরিতে লেখা রোজনামচা। একদিন তিনি সব পাণ্ডুলিপি সৌম্যর হাতে তুলে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলি সে যেন পুড়িয়ে দেয় চিতায়।

সৌম্য সে অনুরোধ রাখতে পারেনি। পাণ্ডুলিপিতে ঠাসা ব্রিফকেসটা পড়ে আছে স্টাডিরুমের এককোণে; যেন একটা খয়েরি ডোরাকাটা বেড়াল নির্বিঘ্নে শুয়ে আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে তার দিকে চেয়ে। জ্বলজ্বলে, শান্ত, হিমশীতল চোখ দুটোর দিকে তাকালে আর ফেরানো যায় না। সে ব্রিফকেসটা খুলে ধীরেধীরে তাঁর রচনা পড়তে শুরু করে।

সৌম্যর সঙ্গে তাঁর পরিচয় মাত্র কয়েক বছরের। একটি পত্রিকা সম্পাদনার সূত্রে। তাদের ভিতর বয়সের ফারাক ছিল অনেক; প্রায় কুড়ি বছরের কাছাকাছি; অথচ এক আশ্চর্য বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সৌম্যের জীবনে বহু সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল তাঁর নানান উপদেশ। সৌম্য এমএনসি-র চাকরি ছেড়ে

শুরু করেছে একটা টিভি সিরিয়াল। এরই পাশাপাশি ফিল্ম ক্রিটিক হিসাবে একটি দৈনিক সংবাদপত্রে লেখা; নাটকের সেট ডিজাইন করা এবং এক ট্রাভেল জার্নালে ফ্রিল্যান্স রিসার্চ করা। ব্যাঙ্গালোর থেকে ফেরার আগেই সবশেষ। তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয়নি।

পেন্সিলে আঁকা তাঁর একটা বড়ো পোর্ট্রেট টাঙানো রয়েছে বেডের মাথায়। গলায় ঝুলছে রজনীগন্ধার মালা। তাঁর বেডরুমটা অজস্র জিনিসে ঠাসা ; একটা ডিভান, স্টিলের আলমারি, কয়েকটা বেতের চেয়ার, গ্লাস টপ দেওয়া একটা ছোটো গোল টেবিল এবং দেওয়াল জুড়ে র‍্যাক; র‍্যাকভর্তি বই — রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, এমনকি ফুলগাছ চাষের পদ্ধতি পর্যন্ত। দেওয়ালের কোণে, দরজার পিছনে যত্রতত্র হুকে ঝুলছে পাঞ্জাবী, পাজামা, টাওয়েল, রেনকোট, ছাতা, এমনকি কাঁধের ব্যাগ পর্যন্ত। টেবিলের উপর ছড়ানো স্তূপীকৃত বই, ম্যাগাজিন, রুলটানা কাগজ, প্যাড, পেন্সিল, ছুরির মতো কলম, আঠা, ইরেজর ও স্টেপলারের মতো অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস।

তাঁর মেমারি ছিল ফটোগ্রাফিক। তিনি মুখে মুখে অঙ্ক কষতেন। কখনো শব্দ বা সংখ্যা দিয়ে বানাতেন নানান ধরনের মজার খেলা। তিনি যেন চলন্ত ডিকশনারি। মাটির রূপ থেকে ফুলের রঙ পরিবর্তন পর্যন্ত বিচিত্র বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতেন জলের মতন।

তাঁর হাঁটু মুড়ে বসা বা উপুড় হয়ে শোয়ার ভঙ্গিটি ছিল অদ্ভুত। তাঁর হাঁটাচলার মধ্যে এমন এক দীপ্তভঙ্গি ছিল যা মুহূর্তে সবার নজর কেড়ে নিত। কফির টেবিলে তিনি ছিলেন মধ্যমণি। এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সর্বদা তাঁকে ঘিরে রাখত ছায়ার মতো। তাঁর টানে অনেকেই ছুটে আসতেন দূর-দূরান্ত থেকে।

সৌম্য ভাবে জীবনযুদ্ধে এত লড়াইয়ের পরেও তিনি এমন জীবনীশক্তি পেতেন কোথা থেকে? সাদা ধব্‌ধবে পাজামা পাঞ্জাবী পরে মাঝেমধ্যে সৌম্যকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়তেন গঙ্গার ধারে। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতেন অনর্গল— সন্ধ্যার আগে গঙ্গার জল কেন তামাটে হয়ে ওঠে, আকাশ তেতে ওঠে আগুনের মতো মধ্যরাতে, গরম হাওয়া শুষে নেয় দেহের রক্ত ; আর কাছের জিনিসগুলো ছোটো এবং দূরের জিনিসগুলো বড়ো দেখায়। প্রকৃতির সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে শরীরের, শরীরের সঙ্গে চারপাশের পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে বোঝাতেন বিস্তর; যেন এক জ্ঞানের ভান্ডার।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন তিনি। যে উপন্যাসটা সম্প্রতি লিখতে শুরু করেছিলেন তার খানিকটা অংশ এখনও বাকি। একজন সমাজবিজ্ঞানী সরকারি চাকরিসূত্রে যান কালিম্পং। কাজের ফাঁকে ভূটানী রিফিউজিদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন

একটা ছোটো কমিউন। তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে শুরু করেছিলেন আন্দোলন। আন্দোলন রাজনৈতিক আকার নেওয়ার আগেই সরকারি চাপে তাঁকে ছাড়তে হয় ওই অঞ্চল। বহুদিন পর মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় দেরাদুনের এক স্যানিটোরিয়ামে।

সৌম্য ভেবেছিল উপন্যাসটা শেষ হলে একটা টিভি সিরিয়াল তৈরি করবে। এই নিয়ে দুজনে ভাবনাচিন্তা করেছিল কিছুদিন। ছবির শুরুটা কেমন হবে। কোন কোন লোকেশনে শট নেওয়া হবে। এমনকি রং ব্যবহার এবং আবহ সংগীত নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে। শুধু সিরিয়ালের নামকরণ নিয়ে তাঁর ছিল দ্বিধা।

এমন সংশয় ও দ্বিধার জন্যে তাঁর সংসার করে ওঠা সম্ভব হয়নি কোনোদিন। তাঁর ওই ছন্নছাড়া, বাউন্ডুলে, নিঃসঙ্গ জীবনের ফাঁকে সৌম্য যে কীভাবে ঢুকে পড়েছে নিজেও জানে না। ছোটোবেলায় সিনেমার আকর্ষণে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বাই-এ। রাস্তায় পোস্টার সাঁটার কাজ থেকে শুরু করে কাগজ ফিরি করা; প্রেসে কপিবয়ের কাজ, এক দেশি কোম্পানির সাবান বেচা, এমনকি হোটেলের লিফ্‌টম্যানের কাজ করেছেন বহুদিন। শিখেছেন বেশ কয়েকটি ভাষা। এমন বিচিত্র জীবিকার ফাঁকে রাত জেগে পড়াশোনা করেছেন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়িতে।

এমন কঠিন জীবনসংগ্রামে তিনি আত্মবিশ্বাস হারাননি কখনো। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় চরকির মতো ঘুরেছেন এক শহর থেকে অন্য শহরে। এক ফটোগ্রাফারের অ্যাসিটেন্ট হয়ে চলে এসেছেন কলকাতায়। ছাত্র পড়িয়েছেন কোচিং সেন্টারে। আবার সব ছেড়ে দিয়ে এনজিও-এর কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনুন্নত আদিবাসী এলাকায়।

সৌম্য জানে তাঁর এমন ব্যক্তিগত জীবনে টানাপোড়েনের বহু কাহিনি ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়। তবে সবই কেমন যেন খাপছাড়া, টুকরো-টুকরো, এলোমেলো। কোনোদিনই একটা নিটোল গল্প লেখা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

পাণ্ডুলিপিতে ঠাসা ব্রিফকেসের ঢাকাটা খুলতেই সৌম্যর মনে হয় যেন একটা কফিনের ডালা খুলছে। শব্দের হাড়গোড় ভাঙা একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে এরই ভিতর। পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পাতায় সে এক দীর্ঘশ্বাস শুনতে পায়। কলমের কালি শুকনো রক্তের মতো লাল। মধ্যরাত ছিল তাঁর লেখার সময়। তাঁর লেখার প্রতিটি চরিত্র যেন এক মূল্যবোধহীন, নির্মম পৃথিবীর বাসিন্দা। এক চাপা অভিমান ও দুঃখ ছড়িয়ে আছে রচনার প্রতিটি পাতায়। তাঁর 'জার্নি' গল্পটা সৌম্য পড়তে শুরু করে। "পামেলা আজই ফিরবে ব্যাঙ্গালোরে। মা ক্যানসারে ভুগছে, বিছানায়

শয্যাশায়ী। গত রাত থেকে যন্ত্রণা বেড়েছে। বাবা বহুদিন আগেই ঘরছাড়া, অন্য এক মহিলাকে নিয়ে থাকেন শহরের শেষপ্রান্তে। একমাত্র ভাই ড্রাগ অ্যাডিক্ট, মানসিক রোগী। শহরের জনবহুল এলাকায় বিস্ফোরণের শেষ খবরটা পাঠিয়ে দিয়েছে নেটে। এককাপ ব্ল্যাককফি ও হিম স্যান্ডউইচটা কোনোক্রমে গিলে সে রওনা দিল এয়ারপোর্টে। সময়মতো ছাড়লে প্লেনটা পৌঁছাবে মধ্যরাতে।"

পামেলাকে নিয়ে লেখা যে গল্পটা তার উৎস সৌম্য কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। পামেলার সঙ্গে তাঁর আলাপ দিল্লির এক ফটোগ্রাফি এক্সিবিশনে। এক গোঁড়া সিরিয়ান ক্রিস্টিয়ান পরিবারের ওই মেয়েটির মা ছিলেন কানাডায় ডাক্তার। বাবা চাকরি করতেন ইন্দোনেশিয়ায় এক জাহাজ কোম্পানিতে। পামেলার জন্ম মনট্রিয়লে। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট করে সে দেশে ফিরে এসেছে জার্নালিজম করার স্বপ্ন নিয়ে। একজন ফটোগ্রাফারের সঙ্গে থেকেছে দিল্লিতে কয়েক বছর। সম্পর্ক দুটি ভেঙে গেছে সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে। ভালোবাসার এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা পামেলাকে নতুন কোনো সম্পর্ক গড়ে তোলা থেকে বিরত রেখেছে। পামেলার এই অনিশ্চিত জীবন কাহিনির সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক আজও অজানা থেকে গেছে সৌম্যর কাছে।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আরও অনেককিছু সৌম্যর কাছে অজানা। অযথা জানার আগ্রহও সে কোনোদিন প্রকাশ করেনি। শুধু শুনেছে তিনি একসময় বার্মায় পরিবার ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন শিলঙে এক খ্রিস্টান ফাদারের কাছে। তাঁদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল কাঠের। তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন আসাম, ত্রিপুরা বা মণিপুরে। তিনি বাবার কথা কখনো বলেননি; মাকে হারিয়েছিলেন খুব অল্প বয়সে। মায়ের স্মৃতি আজও বাক্সবন্দি হার্মোনিয়াম-এ; টেবিলের নীচে পড়ে। এটা হাতছাড়া করেননি কখনো ; সর্বত্র নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মায়ের একটা পুরোনো ল্যামিনেট করা ফটোগ্রাফ ঝোলানো দেওয়ালের এককোণে। অন্য কারো কথা তিনি বলেননি কোনোদিন। ছিন্নমূল এই মানুষটির সারাটা জীবন যেন সাদা-কালোয় ছকবন্দী ক্যালেন্ডারের পাতায় সাজানো সংখ্যার মতো সুনির্দিষ্ট, অথচ সীমাহীন।

সৌম্য তাঁর লেখার ভিতর কোনো পারম্পর্য খুঁজে পায় না। হঠাৎ শুরু, আবার হঠাৎ শেষ। ছেঁড়া টুকরো টুকরো রচনাগুলো জুড়ে সৌম্য তাঁর ভাবনার মূলে পৌঁছতে চায়। কোথাও কোনো জায়গার নাম বা তারিখের উল্লেখ নেই। সৌম্য ভাবে এর ভিতর তাঁকে কতটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে? যেন একটা ছোটো রাস্তা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারের দিকে।

লেখা ছাড়া তাস খেলা, ফটো তোলা বা স্কেচ করা ছিল তাঁর অবসর কাটানোর

উপায়। পাণ্ডুলিপির ফাঁকে জটিল রেখার টানে আঁকা কিছু গাছপালা, জীবজন্তু বা মানুষের মুখ ; এরই ভিতর কিছু নারীমুখ উঁকিঝুঁকি মারে। এরা কে বা কারা কে জানে। মহিলাদের নিয়ে অহেতুক কৌতূহল তিনি অপছন্দ করতেন।

কখনো কখনো তিনি ভয়ানক আত্মমগ্ন হয়ে পড়তেন। গভীর রাতে একা একা পায়চারী করতেন ছাদে; লক্ষ করতেন তারাদের গতিবিধি; যেন খুঁজে বেড়াতেন মহাকাশের অসীম রহস্যকে। মহাবিশ্বের বহু তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ; তার অসংখ্য ফটোগ্রাফ জমানো স্ক্র্যাপবুকে।

একজন আত্মসচেতন মানুষের যা যা দোষগুণ তার সবটুকু মিলে এক অন্যসত্তা তাঁকে সবার থেকে স্বতন্ত্র করেছে। অপ্রিয় সত্যভাষণ করতে তিনি পিছপা হতেন না। এর জন্যে তিনি যেমন সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছেন তেমন মিষ্টি ব্যবহারের জন্য অনেকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গীটি ছিল চমৎকার ; অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল। তাঁর যুক্তিগুলো তিরের ফলার মতো বিঁধত। আর কথার পিঠে কথা সাজিয়ে তর্কের জালে তিনি তুলে আনতেন ঝিকিঝিকি পাথরের মতো টুকরো টুকরো আলো।

সৌম্য দেখে ব্রিফকেসের ভিতর রয়েছে উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধের খসড়া, চিঠিপত্র ও অসমাপ্ত ডাইরিটা; তার শেষ কয়েকটা সাদা পাতায় আঁকিবুঁকি কাটা; এছাড়া অসংখ্য কাগজের টুকরোয় নাম ও ঠিকানা লেখা। তাঁর লেখার গতি কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর; কখনো ভাষা অতি সচেতন, কখনো স্বতঃস্ফূর্ত; কোথাও স্পষ্ট, কোথাও বা অস্পষ্ট; অসংখ্য কাটাকুটি, কালো ও লাল কালিতে ভরা, বিচিত্র দাগের বিদ্‌ঘুটে সব চেহারা।

কোথা থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবন; কোথায় ছিল তাঁদের আদি নিবাস; কী তাঁর বংশ পরিচয়; কেন বা পরিবার ছেড়ে একা একা কাটিয়েছেন সারাটা জীবন। এমন প্রশ্নের উত্তর তিনি অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন সর্বদা।

মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ছিল তীব্র ভালোবাসা। অতি সচেতনভাবে এড়িয়ে চলতেন বিদেশি ভাষা। কিছুদিন ভাষার উৎপত্তি ও রূপান্তর নিয়ে চর্চা করেছিলেন। বহু অপ্রচলিত, জীর্ণ, মৃতপ্রায় শব্দকে নতুন অর্থের দ্যোতনায় তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়। নতুন নতুন শব্দ তৈরী করেছেন খেলার ছলে।

তাঁর এক উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলেন ভাষাবিদ। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ভিতর পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার উৎস খোঁজা। এরই সূত্রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ বিদেশে। গবেষণায় মগ্ন হতে গিয়ে হারিয়েছেন পরিবার ও বহু সামাজিক সম্পর্ক। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যশয্যায় শেষমুহূর্তে জানতে পারেন তাঁর গবেষণাপত্র নকল করে অন্যের নামে প্রকাশিত হয়েছে এক বিদেশি জার্নালে।

সৌম্য ভাবে তাঁর বেশিরভাগ লেখায় এমন ট্রাজেডির অভিব্যক্তি। অথচ সবার চোখে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সফল এক জনপ্রিয় ব্যক্তি। সামাজিক জীবনে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। যে কোনো চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে তিনি পিছ্পা হতেন না। প্রথাভাঙা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কাজ। বহু সামাজিক রীতিনীতি, আইনকানুন কিছু মানুষের স্বার্থে বানানো দুরভিসন্ধি বলে তিনি মনে করতেন। স্বভাবে ছিলেন নাস্তিক। আবার প্রয়োজনে ধর্মভীরুদের উপদেশ দিতে পিছ্‌পা হতেন না।

একটা গল্পে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। গল্পের নায়ক তিরিশ বছরের এক যুবক আখ মাড়াইয়ের কারখানায় শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ছত্রিশগড়ের এক জঙ্গলে খুন হন। তাঁর কাজ ছিল শ্রমিকদের দাবী দাওয়া বিষয়ে সচেতন করে তোলা। বিচারের নামে এক প্রহসনের অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে গল্পের শেষ অংশে। যে কোনো এস্টাবলিশ্‌মেন্টের প্রতি তাঁর ছিল ভয়ানক অনাস্থা। পুলিশ, প্রশাসন, আদালত, শিক্ষাব্যবস্থা; এমন বহু বিষয়ের তিনি ছিলেন কট্টর সমালোচক। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের নিম্নবর্গের ঘুমিয়ে থাকা মানুষেরা নিশ্চিত একদিন জেগে উঠবে। তারা গুঁড়িয়ে দেবে এই ঘুণধরা সমাজটা। তিনি খুঁজেছিলেন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে অর্থনীতির, অর্থনীতির সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক। এমন মতামত তুলে ধরার জন্য সম্পাদনা করেছিলেন একটি মাসিক পত্রিকা 'সমবেত কণ্ঠস্বর'।

সৌম্য জানে একবার ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে কয়েকজন যুবক আত্মগোপন করেছিল তাঁর ফ্ল্যাটে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বর্ডারে চেকপোস্ট উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল গভীর রাতে। এরই সূত্রে পুলিশ কয়েকবার হানা দিয়েছে তাঁর ফ্ল্যাটে। ওই যুবকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কারণ এবং এই সম্পর্কের সূত্র কতদূর ছড়িয়েছে তা ছিল গোয়েন্দাদের অনুসন্ধানের বিষয়।

কয়েকটা চিঠিপত্র খুলে সৌম্য দেখে বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান ব্যক্তির লেখা। এইসব চিঠিতে কেউ তাঁকে সম্বোধন করেছে কাকা, দাদা, নিছক বন্ধু বা সরাসরি নামে। চিঠির কালো কালিতে লেখা অক্ষরগুলো যেন সৌম্যকে টানতে টানতে নিয়ে চলে এক অন্ধকার গলিপথে। সৌম্য এদের কাউকে চিনতে পারে না। শুধু আন্দাজ করে নিতে পারে ভাসা ভাসা; তাদের চেহারা, ভাঙাচোরা মুখ, তীব্র চোখের চাউনি, চোয়ালের কঠিন অংশ, শক্ত দাঁতের মাড়িতে অবিশ্বাস, ক্রোধ ও ঘৃণা; যেন এরা মানুষ নয়; মানুষের মুখোশধারী কতকগুলি ছায়া।

অন্যের সহানুভূতি পাওয়া ছিল তাঁর কাছে ভীষণ লজ্জার। সমস্ত দুঃখকষ্টের

ভিতর মাথা উঁচু করে বাঁচা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। সৌম্য ভাবে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি সে কখনো দেখেনি যিনি নিজের খাবার অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছেন; নিজের পরনের কাপড় বিলিয়ে দিয়েছেন গরীবদের মধ্যে; বিনা পারিশ্রমিকে পড়িয়েছেন অনাথ ও বস্তির ছেলেমেয়েদের; অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন অন্যের হয়ে। পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটা ফুটে বেরোচ্ছে ফটোগ্রাফে। মৃত্যুর আগের মুহূর্তেও গোঁফের আড়ালে তাঁর হাসির শেষ রেখাটুকু এখনও লেগে।

নিজের দুর্বলতা তিনি প্রকাশ করেন নি কোনোদিন। সব সুখদুঃখ নিজের ভিতর জমিয়ে রাখতেন পাহাড়ের মতো। তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রকাশ সৌম্য দেখেনি কোনোদিন। তাঁর সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয় ছিল প্রকৃতি— পাহাড়, অরণ্য, সমুদ্র অথবা নদী। তারই টানে তিনি বেড়িয়ে পড়তেন এখানে ওখানে। অসংখ্য ফটোগ্রাফে ধরা সেইসব অজানা দৃশ্য। এমন অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে তাঁর উপন্যাসে। উপন্যাসে নায়কের এক গভীর জঙ্গলে রাত্রিবাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : "চাঁদনী রাতে পাহাড়ের গায়ে কাঠের বাড়ীগুলো যেন খেলনার মতো সাজানো সারি সারি। জানলার ফাঁকে লণ্ঠনে আলোর টুকরোগুলো চুমকির মতো জ্বলছে। মাঝেমধ্যে ঝাউপাতারা কেঁপে উঠছে মৃদু হাওয়ায়। জ্যোৎস্নারাতে নদীর ধারে জল খেতে আসে বাঘেরা। বুনো হাতিদের ডাকে কেঁপে উঠছে ফরেস্ট বাংলো। ইলেকট্রিক লাইট বা টেলিফোন এখনো পৌঁছোয়নি এখানে। পায়ে হাঁটা চরাই-উৎরাই-এর পথ। এই পাহাড় ঘেরা অরণ্য এলাকাকে সরকার উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছে। বহু সন্ত্রাসবাদী নাকি লুকিয়ে রয়েছে এখানে।" কুমায়ুন থেকে কন্যাকুমারিকা তিনি ঘুরেছেন একা। দেখেছেন সমুদ্রের জল কখন রং পাল্টায়, পাহাড়ের আকৃতি জ্যামিতিক রূপ নেয় অথবা মাটির আদলে গাছেরা বেড়ে উঠে বিচিত্রভঙ্গিতে; নদী এঁকেবেঁকে কোন পথে অদৃশ্য হয় ঘনজঙ্গলে। আলোর সঙ্গে পাল্টায় দিনের রং; কখনো কমলা, কখনো হলুদ, কখনো বা গাঢ় নীল-সবুজের ছায়ায়। বিচিত্র রঙের ফুল ও প্রজাপতিদের মেলা বসে এরই মাঝে। তাঁর এমন আশ্চর্য অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে লেখার নানান ছত্রে। আবার কখনো আবেগের বশে হারমোনিয়ামটা কোলে টেনে নিয়ে উদাত্তকণ্ঠে গেয়ে উঠতেন রবীন্দ্রসংগীত; দ্রুতগতিতে এঁকে চলতেন স্কেচের পর স্কেচ; সে এক আশ্চর্য মুক্তির স্বাদ তিনি অনুভব করতেন।

সৌম্য তাঁর জীবনের এমন টুকরো অসংখ্য ঘটনাগুলো জুড়ে একটা রূপরেখা তৈরির চেষ্টা করে। তাঁর বিশেষ পছন্দের জিনিসগুলো ছড়িয়ে রয়েছে ঘরের চতুর্দিকে— একটা বড়ো ডায়ালের হাতঘড়ি, ছুরির ফলার মতো কলম, চৌকো

ছককাটা সিগারেটের বাক্স, চামড়ার হাতব্যাগ এবং কাঁচের ফ্লাওয়ার ভাস। তাঁর ব্যবহৃত খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাক্সবন্দি জামাকাপড়, রাশিরাশি বই এবং অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস, সৌম্য ভাবে কার হাতে তুলে দেবে। সৌম্য তাঁর ডাইরীর পাতাগুলো ওল্টাতে থাকে, ভাবে যদি কোথাও কোনো ইচ্ছার কথা তিনি প্রকাশ করে থাকেন। ডাইরির কয়েকপাতা উল্টে হঠাৎ সৌম্য থমকে দাঁড়ায়। তাতে এমন সব কথা লেখা আছে যা তার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়ের, বিস্ফোরক ও 'শকিং' মনে হয়; যেন তাঁর চরিত্রের সঙ্গে একেবারেই বেমানান ও অকল্পনীয়—অতিরিক্ত মদ্যপান থেকে শুরু করে একাধিক নারীসঙ্গ, বেশ্যালয়ে যাওয়া, পুলিশ লক-আপে রাত কাটানো, এমনকি আত্মহত্যা করতে যাওয়ার মতো একাধিক ঘটনার বিবরণ। সৌম্য ভাবে ডাইরিটা সে পুড়িয়ে দেবে যাতে ভবিষ্যতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এই কথাগুলো কেউ জানতে না পারে; আবার পরক্ষণেই মনে হয় ডাইরিটা প্রকাশিত না হলে তাঁর জীবনের অনেক কিছুই অজানা থেকে যাবে এক অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির মতো।